সন্তানের চরিত্র গঠনে পরিবার ও পরিবেশ

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

সন্তানের চরিত্র গঠনে পরিবার ও পরিবেশ

সন্তানের চরিত্র গঠনে
পরিবার ও পরিবেশ

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৪৮

৫ম প্রকাশ (আ. প্র. ২য়)

জমাদিউল আউয়াল	১৪২৭
আষাঢ়	১৪১৩
জুলাই	২০০৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHANTANER CHARITRA GATHANE PARIBAR O PARIBESH by Prof. Mazharul Islam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

সন্তান-সন্ততি হলো মা-বাবার নয়নের মণি। সন্তান-সন্ততি চরিত্রবান ও সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠুক এটাই আমরা বাবা-মারা সবাই চাই। কিন্তু মা-বাবার ঐকান্তিক এ কামনা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা আশানুরূপ চরিত্র নিয়ে অনেক সময় গড়ে ওঠে না। তার কারণ সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে মা-বাবা এবং পরিবার ও পরিবেশের ভূমিকার বিভিন্নতা।

নয়নের মণি যে সন্তানের দুনিয়াবী কষ্ট আমরা সইতে পারি না—সেই সন্তান যদি সচ্চরিত্রবান না হয়, সৎ ও সুনাগরিক হয়ে গড়ে না ওঠে, খাঁটি ঈমানদার না হয় তাহলে মা-বাবারা অশান্তিতে জ্বলে মরে। আদরের ধন সেই সন্তানের পরকালে কি হবে তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

লেখকের এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি সন্তান লালনে বাবা-মাদের ভূমিকা নিরূপণে সাহায্য করবে এ কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে সুন্দর ও সৌরভময় ফুলের মত করে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

—প্রকাশক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. শিশুরা ফুলের মত সুন্দর	৭
২. যে শিশু সৌরভ ছড়ায় সে-ই বড় হয়ে দুর্নাম কুড়ায়	৭
৩. আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন	৭
৪. সুন্দর শিশু একদিন অসুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে	৮
৫. সুন্দর শিশু সুন্দর মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে	৯
৬. বংশানুক্রম	৯
৭. পরিবেশ	১০
৮. দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য	১১
৯. সুসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রচেষ্টা	১২
১০. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৩
১১. আকিকাহ্	১৪
১২. খত্না করা	১৪
১৩. স্নেহ-মমতা	১৫
১৪. দুধ পান করানো	১৫
১৫. সন্তান লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ	১৬
১৬. শিক্ষাদান ও নৈতিক চরিত্র গঠন	১৬
১৭. সন্তানের প্রতি ন্যায়বিচার	১৭
১৮. মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য	১৭
১৯. পরিবার ও পরিবেশের আদর্শ	২০
২০. মানুষের সৃষ্ট আদর্শ নির্ভেজাল নয়	২১
২১. আল্লাহর দেয়া আদর্শই কেবল নির্ভেজাল	২১
২২. ইসলাম আদর্শের অনুশীলনই সুন্দর মানুষ গড়ে তুলতে পারে	২২
২৩. গর্ভে সন্তান আগমন ও মা-বাবার আকাঙ্ক্ষা	২২
২৪. গর্ভস্থ শিশুর ওপর মায়ের প্রভাব	২৩
২৫. গৃহের পরিবেশ ও পরিবার	২৪
২৬. বাবা-মা'র সঙ্গ ও পরিচালন নীতি	২৬
২৭. স্কুলের পরিবেশ	৩৪
২৮. শিশু এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩৪
২৯. শিশুর খেলার সাথী	৩৫
৩০. ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল এবং কিছু করণীয়	৩৬

بسم الله الرحمن الرحيم

সন্তানের চরিত্র গঠনে পরিবার ও পরিবেশ

শিশুরা ফুলের মত সুন্দর

শিশুরা মাসুম। নিষ্পাপ, ফুলের মত সুন্দর। বাবা-মার নয়নের মণি, কলিজার টুকরা। শিশুদের কোলে নিয়ে শুধু বাবা-মা নয়—সকলেই আদর করে, চুমো দেয়। শিশুদের মুখের হাসি প্রস্ফুটিত ফুলের মতই সৌরভ ছড়িয়ে দেয় চারদিকে।

মায়ের কোলের ছোট্ট অবুঝ শিশু একদিন হামাগুড়ি দিতে শেখে, হাটতে শেখে, আধো আধো করে কথা বলতে শেখে। আস্তে-আস্তে বড় হয়, মা-বাবার কোল ছেড়ে তার বিরচণের পরিসরও হয়ে ওঠে বড়।

বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, খেলার সাথী, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সহপাঠি, শিক্ষক, বাইরের অগণিত মানুষের সাথে মিশে আস্তে আস্তে সে সামাজিক হয়ে গড়ে ওঠে।

যে শিশু সৌরভ ছড়ায়, সে-ই বড় হয়ে দুর্নাম কুড়ায়

যে শিশু একদিন মায়ের কোল আলোকিত করে, যে শিশু ফুলের মত সৌরভ ছড়ায় চারদিকে, সেই শিশু যখন সমাজে বড় হয়ে ওঠে তখন কিন্তু সকলকে একরূপ দেখা যায় না। তখন দেখা যায় কেউ ছড়ায় সুবাস, পায় ভালোবাসা—কেউ কুড়ায় দুর্নাম আর ঘৃণা। কাউকে দেখে বাবা-মার মন হয় পুলকিত, আবার কাউকে দেখে হয় আতংকিত ও ব্যথিত।

আল্লাহ মানুষকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝ اِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

"আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। পরে আমি তাকে উল্টা ফিরিয়ে সর্ব নিম্নস্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। সেই লোকদের ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করতে থেকেছে, তাদের জন্য অবশ্যই অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে।"–সূরা আত তীন ঃ ৪-৬

মহান রাব্বুল আলামীন মানুষকে যে সুন্দর ও উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন, তা দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তের, যে কোনো ভাষা বা বর্ণের, যে কোনো সমাজ এবং কৃষ্টির শিশুর দিকে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়। কেননা শিশুরা সকলেই তখন মাসুম ও নিষ্পাপ থাকে। শিশুর দেহ মন, হাসি-কান্না, নড়ন-চড়ন সবই নিষ্কলুষ থাকে। তাইতো শিশুদের তুলনা করা হয় ফেরেশতাদের সাথে। কথায় কথায় মানুষ বলে, 'শিশু নয় যেন—ফেরেশতা'।

সুন্দর শিশু একদিন অসুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে

ছোট্ট শিশু যখন বড় হয়, তখন তাদের অনেকেই আর সুন্দর থাকে না। বড় হয়ে তারা নিজের দেহ এবং মনের শক্তিকে এমনসব পাপ বা খারাপ কাজে প্রয়োগ করে যা তাকে নৈতিকতার চরম অধঃপতনে বা নিম্নতম স্তরে পৌঁছে দেয়। লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, যৌন-কামনা-বাসনা, ক্রোধ, আক্রোশ, সংকীর্ণতা, নীচতা, হীনতা ইত্যাদি খারাপ স্বভাবে যখন মানুষ ডুবে যায় তখন নৈতিকতার সর্ব নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে। তাইতো দেখা যায়, পালাক্রমে ৮/১০ জন যুবক মিলে দলবদ্ধভাবে একই যুবতীকে ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় না. পরিশেষে তাকে হত্যা করে আনন্দ লাভ করে। যুবতীর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। লোভের বসে ঠাণ্ডামাথায় মাসুম বাচ্চাসহ পরিবারের সকলকে কুপিয়ে খুন করতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন নির্বাপিত করার জন্য মানুষের রক্তে বন্যা বয়ে দেয়া হয়। বাবা, মা, ভাই, স্বামীর সামনে নারীদের সতীত্ব হরণ করে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে তারা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে গাছ-পালা জীব-জানোয়ারের পূজা করে—শুধু তাই নয়—এত নিম্ন স্তরে চলে যায় যে, পুরুষ এবং স্ত্রীর লীঙ্গকে পূজা করতে তারা লজ্জাবোধ করে না। তারা পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে চলে যায়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ط

"তারা পশু নয়, বরং পশুর চেয়েও অধম।"

সুন্দর শিশু সুন্দর মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে

শিশু যখন বড় হয় তখন তাদের অনেকের মধ্যে আবার এমন সব গুণের সমাবেশ ঘটে যা তাদেরকে চরিত্রবান এবং সৎ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এমন ভাল মানুষও সমাজে দেখা যায় যে, দুর্বৃত্তরা যুবতী অপহরণ করে নিয়ে চলেছে আর একজন পথচারী তার চিৎকার শুনে অবলা যুবতীকে রক্ষা করতে ছুটে এসে অপহরণকারীদের আঘাতে জর্জরিত হয়ে প্রাণ বিলিয়ে দেয়। দরিদ্র রিকশাওয়ালা তার রিকশায় টাকার থলি কুড়িয়ে পেয়েও নিজের জীবনকে সুখের সাগরে ভাসাবার সপ্নে বিভোর না হয়ে টাকার মালিককে খুঁজে বের করে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসে। লোভ-লালসা তাদের স্পর্শ করতে পারে না। নিজেরা ভাল থাকে এবং আরো দশজনকে ভাল রাখার প্রচেষ্টা চালায়। ধীরে ধীরে তারা নৈতিকতার উন্নত সোপানে আরোহণ করে। তারা চরম অভাব দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তবু আদর্শ এবং নীতি থেকে বিচ্যুত হয় না।

ছোট শিশুই বড় হয়ে সমাজে একদিন এসব বিভিন্ন দোষগুণ ও চরিত্রের অধিকারী হয়। তাহলে প্রশ্ন—মায়ের পেট থেকেই কি এসব চারিত্রিক দোষ-গুণ নিয়ে শিশু দুনিয়ায় আসে ?—না কি নিষ্পাপ শিশু সমাজের সাথে মিশে আস্তে আস্তে এসব দোষ অর্জন করে ? প্রশ্ন জাগে কিসের দ্বারা শিশু এসব দোষ গুণ অর্জনে প্রভাবিত হয় ?

মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে—বংশানুক্রম (Heredity) এবং পরিবেশ (Environment) শিশুর লালন-পালন এবং পরিবর্ধনের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, যার কারণে শিশুর পরবর্তী ব্যক্তি জীবন ভাল বা মন্দরূপে গড়ে ওঠে।

বংশানুক্রম

মানবশিশু উত্তরাধিকার সূত্রে বাবা-মা এবং পূর্বপুরুষ থেকে যেসব গুণাগুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাকেই বলা হয় বংশানুক্রম। দৈহিক এবং জৈবিক কিছু গুণাগুণ শিশু তার বাবা-মা থেকে বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত হয়। যেমন বেঁটে বা লম্বা হওয়া, ফর্সা বা কাল হওয়া ইত্যাদি। Woodwarth-এর মতে "Heredity covers all the factors that are present in the individual when he begins life not at birth but at the time of conception about nine months before." অর্থাৎ মাতৃগর্ভে ডিম্বকোষ ফলবতী হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি যা নিয়ে তার জীবন শুরু করে তাই তার বংশানুক্রম। আর জীবনটা শুরু হয় ভূমিষ্ট হওয়ার

সময় নয়—তারও প্রায় নয় মাস পূর্বে। বংশানুক্রম একটি সহজাত গুণ। এটা কখনো পরিবর্তন করা যায় না।

পরিবেশ

একটা শিশুকে যা বেষ্টন করে থাকে তাকেই বলা হয় সেই শিশুর পরিবেশ। শিশু জন্মের পূর্বে এবং পরে কতকগুলো অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়—এসবই হলো তার পরিবেশ। Woodwarth-এর মতে Environment covers all the outside factores that act on individual since he begins life." জন্মের পর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাকিছু ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেটাই পরিবেশ। যখন শিশু মায়ের গর্ভে থাকে তখন তার পরিবেশ থাকে খুবই সংকীর্ণ। ভূমিষ্ট হওয়ার পর শিশুকে এক নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। শিশু কাঁদে, হাসে, হাত পা নাড়ে, আঙুল চোষে ইত্যাদি তার বিভিন্নমুখী আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর পরিবেশের গণ্ডিও উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আচরণের পরিসর অনেক বড় হয়। পরিবেশের প্রভাবেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন রকম দোষ-গুণ এবং আচরণ ও ব্যবহারের সমাবেশ ঘটে। পরিবেশের প্রভাবের কারণেই ডাকাতের ছেলে ডাকাত না হয়ে ভালো মানুষ হয়ে গড়ে ওঠতে দেখা যায়। আবার সূফী-দরবেশের ছেলেকে সূফী-দরবেশ না হয়ে খারাপ মানুষ হতে দেখা যায়।

নবী করীম (স) বলেন, প্রত্যেক সন্তানই ফিৎরতের ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতপর তার পিতা-মাতা (নিজেদের সংশ্রব দ্বারা) তাকে ইহুদী করে বা খৃস্টান করে দেয় অথবা অগ্নি উপাসক করে দেয়। এখানে ফিৎরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দীন বা সত্য কবুল করার যোগ্যতা। সকল মানব-সন্তানই এ যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যদি তাদের পরিবেশ তাদের অন্য পথে চালিত না করতো, তাহলে সকলেই সত্য কবুল করত। আর সে সত্য হচ্ছে ইসলাম।

Harvert (হার্বার্ট), Cattel (কেটেল) প্রভৃতি পরিবেশবাদীগণ বলেন যে, একমাত্র উপযুক্ত পরিবেশই শিশুর দৈহিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। কাদামাটির সাহায্যে যেমন ইচ্ছা তেমন পাত্র গড়া যায়, তেমনি পরিবেশের প্রভাবেই শিশু চরিত্রবান সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে। মনোবিজ্ঞানী এবং আচরণবাদী Watson বলেন, "আমাকে একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দাও আমি ইচ্ছামত তাকে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিল্পী, যে কোনো ভাবে গড়তে পারবো।"

শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর সাধারণত তিনটি পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। যেমন—গৃহের পরিবেশ, স্কুলের পরিবেশ এবং খেলার সাথীদের পরিবেশ। এসব পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করার আগে মাতৃগর্ভের যে সংকীর্ণ পরিবেশে শিশুর যাত্রা শুরু হয় সেটা আলোচনা করা দরকার।

কারণ আগেই বলা হয়েছে শিশুর জন্ম লাভের পর থেকে জীবন শুরু হয় না, বরং তার জীবন শুরু হয় মাতৃগর্ভে ডিম্বকোষ ফলবতী হওয়ার সময় থেকে।

দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য

একজন পুরুষ এবং নারীর বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। দাম্পত্য জীবনের মূল লক্ষ্য হলো শিশুর জন্মদান, তাদের লালন-পালন এবং দুনিয়াতে নিজ প্রজন্ম সংরক্ষণ। আল্লাহ বলেন ঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ

"যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পসন্দ হয় তার মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চারজনকে বিবাহ করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩

ইসলামের দৃষ্টিতে বয়প্রাপ্ত নর-নারীর পক্ষে বিবাহ করা একটা ফরয ইবাদাত। নবী করীম (স) বলেছেন, হে যুব সম্প্রদায়—তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের যোগ্যতা রাখে সে যেন বিবাহ করে। এবং যে বিবাহের সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার যৌন প্রবণতাকে দমন করবে। বিবাহের পর স্বামী এবং স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমেই সন্তানের জন্ম-প্রক্রিয়া শুরু হয়। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ

فَالْـئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص

"এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন সম্পন্ন করো এবং কামনা করো যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭

এখানে মু'বাশিরাত মানে যৌন মিলন, আর আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন মানে সন্তানাদি যা লওহে মাহফুজে সকলের জন্য ঠিক করে রাখা হয়েছে। এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে স্ত্রীসহবাস করে সন্তানাদি লাভের জন্যে দোয়া করা।

নিছক যৌন লালসা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা বিয়ে এবং যৌন ক্রিয়ার কথা বলেননি। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মধ্যে যৌন লালসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন—মনুষ্য জাতীয় প্রজাতিকে বিশেষ একটি সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত হতে যায়, তখন সে যেন বলেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا ـ

"হে আল্লাহ আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান আমাদেরকে দাও তাদেরকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ।"-বুখারী

একদিকে দৈহিক প্রয়োজন এবং যৌন কামনা নিবৃত্ত করার জন্যে দৈহিক এবং আর্থিক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিয়ে করা অপরিহার্য কর্তব্য। অন্যদিকে প্রত্যেক বিবাহের পেছনে প্রচ্ছন্ন অথচ মূল যে লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে তা হলো সন্তান লাভ। এ সন্তান লাভের উপায়টা সদ্ব্যবহার করার মুহূর্তে ইসলাম যে প্রার্থনা শিখিয়ে দিয়েছে তার তাৎপর্য লক্ষ্য করলে প্রত্যেক স্বামী–স্ত্রী পরবর্তীতে বাবা-মা একথা অনুধাবন করতে বাধ্য যে, দুনিয়ার জিন্দেগীতে সন্তান-সন্ততিকে শয়তান থেকে দূরে রাখার জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে যে প্রার্থনা তা তাদের সন্তানাদি কেমন হবে তার মূল দর্শন এবং ভিত রচনা করে দেয়।

সুসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রচেষ্টা

স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের এ আনন্দঘন মুহূর্তের কামনাকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়িত দেখতে চায়, তাহলে বাস্তব পদ্ধতিও গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র কামনা-বাসনা দিয়ে প্রত্যাশিত ফল লাভ করায় সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"–সূরা আত তাহরীম ঃ ৬

আল্লাহর নবী (স) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য।" আল্লাহ্ তাআলা এবং নবী করীম (স)-এর সব বাণী পিতা-মাতার সদিচ্ছার সাথে তাদের ছেলেমেয়েকে

সুন্দর, চরিত্রবান ও সৎ নাগরিক এবং ঈমানদার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাস্তব ও কার্যকর বিধিব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগের বিরাট দায়িত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান জন্মের সাথে সাথেই পিতা-মাতার প্রতি তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কতগুলো দায়িত্ব কার্যকর হতে শুরু করে এবং তখন থেকেই সে দায়িত্ব অনুযায়ী আমল করা পিতা-মাতার কর্তব্য হয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন ঃ

পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমতঃ তিনটি ঃ জন্মের পর পরেই তার জন্যে উত্তম একটি নাম রাখতে হবে। জ্ঞান, বুদ্ধি বাড়লে তাকে কুরআন তথা ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে। আর সে যখন পূর্ণবয়স্ক হবে তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

বস্তুত সন্তানের ভাল নাম রাখা না রাখা, কুরআন ও ইসলামের শিক্ষাদান না করা এবং পূর্ণ বয়সকালে তার বিয়ের ব্যবস্থা না করা পিতা-মাতার অপরাধের মধ্যে গণ্য। এসব কাজ না করলে পিতা-মাতার পারিবারিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হলো না। ভবিষ্যত সমাজও ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে উঠতে পারে না। এ পর্যায়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য ঃ একটি লোক হযরত উমর ফারুকের কাছে একটি ছেলেকে সাথে করে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ এ আমার ছেলে, কিন্তু সে আমার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তখন হযরত উমর (রা) ছেলেটিকে বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না ? পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বড়ই গুনাহের কাজ তা কি জানো না ? সন্তানের ওপর পিতা-মাতার যে অনেক হক রয়েছে তা তুমি কিভাবে অস্বীকার করতে পারো ? ছেলেটি বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন পিতা-মাতার ওপরও কি সন্তানের কোনো হক আছে ? হযরত উমর (রা) বললেন ঃ নিশ্চয়ই এবং সেই হক হচ্ছে এই যে, (১) পিতা নিজে সৎ ও ভদ্র মেয়ে বিয়ে করবে, যেন তার সন্তানের মা এমন কোনো নারী না হয়, যার দরুন সন্তানের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হতে পারে বা লজ্জা অপমানের কারণ হতে পারে। (২) সন্তানের ভালো কোনো নাম রাখা, (৩) সন্তানকে আল্লাহর কিতাব ও দীন ইসলামের শিক্ষা দেয়া। তখন ছেলেটি বলল ঃ আল্লাহর শপথ আমার পিতা আমার হকগুলোর

একটিও আদায় করেনি। তখন হযরত উমর (রা) সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

তুমি বলছ তোমার ছেলে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আসলে তো তোমার থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে তুমিই তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছ (তার হক নষ্ট করেছ) ওঠো, এখান থেকে চলে যাও।" তার মানে পিতা-মাতা যদি বাস্তবিকই চান যে, তাদের সন্তান তাদের হক আদায় করুক, তাহলে তাদের কর্তব্য সর্বাগ্রে সন্তানদের হক আদায় করা এবং তাতে কোনো গাফলতির প্রশ্রয় না দেয়া।"–পঃ পাঃ জীঃ

পিতা-মাতার ওপর সন্তান পালনের যে কত বড় দায়িত্ব তা উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার। আমরা এখন পিতা-মাতার করণীয়গুলো এক এক করে আলোচনা করবো।

আকিকাহ

সন্তান জন্ম লাভের পর তার জন্য আকিকাহ করা এবং নাম রাখা পিতা-মাতার প্রথম দায়িত্ব।

রাসূলে খোদা (স) বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক নবজাতক তার আকিকার সাথে বন্দী থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষথেকে পশু যবাই করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা কামিয়ে ফেলতে হবে।"–তিরমিযি

শিশুর আকিকার মধ্যে নিহিত রয়েছে সামাজিক, নাগরিক ও মনস্তাত্তিক অর্থাৎ সর্বপ্রকার কল্যাণ বোধ। শিশুর জন্য আকিকার মাধ্যমে একটি সুন্দর নাম রাখা আল্লাহরই হুকুম। হাদীসে আছে যে, আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান-প্রভৃতি আল্লাহর নামের সাথে যেসব নাম সংযুক্ত তা আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পসন্দনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল চার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আবদুর রহমানের ছেলের নাম রাখা হয় বল্টু। মেয়ের নাম রাখা হয় পিংকি। কেউ রাখে পট্কা, কেউ রাখে নাট্কা ইত্যাদি। আরো আরো যেসব নাম আজকাল রাখা হয় তার তাৎপর্য সব পিতা-মাতার চিন্তা ভাবনা করে দেখা দরকার। নাম রাখার পেছনেও বাবা-মার মনস্তাত্ত্বিক দিকটা পরিস্ফুট হয়।

খত্না করা

শিশু পুত্রের পুরষাঙ্গের বর্ধিত চর্ম কর্তন করাকে খত্না বলে। নবী করীম (স) বলেছন, "খত্না করা সকল নবীর সম্মিলিত সুন্নত।"

দুঃখের বিষয় আজকাল বাবা-মা ছেলের খত্না দিতে গিয়ে যেসব কাজ করেন তা সুন্নত আদায় করতে গিয়ে সওয়াব কামাইয়ের পরিবর্তে পাপই কামাই করে থাকে। খত্নার নামে করা হয় ধুমধাম, ঢোল শহরত, খানা-দানা প্রেজেন্টেশান গ্রহণ, রং ছিটানো, নারী-পুরুষের সাজ গোছের বাহার ইত্যাদি।

স্নেহ-মমতা

ছেলে মেয়ের প্রতি বাবা-মার যে মমতা তা চিরন্তন। যে বাবা-মার মধ্যে মমত্ববোধ নেই সে পাষাণ।

আল্লাহ বলেন ঃ

"স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিকে ভালবাসা মানুষের জন্য সৌন্দর্যময় করে দেয়া হয়েছে।" নবী করীম (স) বলেছেন, "যে ছোটদের আদর মমতা করবে না সে আমার দল ভুক্ত নয়।" এ থেকে বুঝা যায় আদর যত্ন ও স্নেহ মমতা লাভ সন্তানদের জন্মগত অধিকার। কাজেই যেসব বাবা-মা সন্তান সন্ততিকে আপদ মনে করে তারা পাষণ্ড এবং নাফরমান ছাড়া আর কি হতে পারে ?

দুধ পান করানো

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর যা খেয়ে জীবন ধারণ করে তা হচ্ছে মায়ের দুধ। ১০ মাস চরমতম কষ্ট সহ্য করে সন্তান প্রসবের পর আবার সে মাকেই সন্তান লালনের চরম কষ্ট পোহাতে হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা মায়ের স্তনে সন্তানের খাদ্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন। শিশুর জন্য যে রকম তরল হালকা এবং লঘু পাচ্য খাদ্য দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঠিক সে রকম খাদ্যই মায়ের স্তনে সন্তান গর্ভে আসার সাথে সাথে সংরক্ষণ করে রাখেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ -

"তার মা তাকে দুর্বলতার পর দুর্বলতা সয়ে পেটে বহন করেছে। আর দুটি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪

কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط

"আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। (এ বিধান ত)ার জন্য যে দুধ পানের মেয়াদ পুরা করতে চায়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩

মায়ের দুধ সন্তানের জন্য যে অত্যন্ত পুষ্টিকর তা চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমাণিত, তাই আজ দেখা যায় অন্য যে কোনো কৃত্রিম ভাবে খাদ্য খাওয়ানোর পরিবর্তে শিশুদেরকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং মা-বাবাদের অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

সন্তান লালন-পালন ও ভরণ পোষণ

সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার। তারা তাদের সামর্থানুযায়ী সন্তানদেরকে হালাল খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করবেন। বাবা-মার উপর সন্তানের এটাও কটি জন্মগত অধিকার।

নবী করীম (স) বলেন, যে কোনো ব্যক্তি গুনাহগার হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে নিজ পোষ্যদের ভরণ পোষণের ব্যাপারে অবহেলা করবে।

নবী করীম (স) আরো বলেছেন, "যে দীনার দান করলে তুমি আল্লাহর পথে জিহাদের কাজে এবং যে দীনার দান করলে ক্রীতদাসের আযাদীর জন্য, যে দীনার দান করলে দরিদ্র মিসকীনের হাতে আর যে দীনার ব্যয় করলে নিজ পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণের জন্য—এসবের মাঝে শ্রেষ্ঠতম প্রতিদান পাবে সে দানের, যা ব্যয় করলে আপন পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের জন্যে।–মুসলিম

নিজের সন্তানাদি প্রতিপালনের জন্য খরচ করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ হাদীসে তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষাদান ও নৈতিক চরিত্র গঠন

নবী করীম (স) বলেছেন, "সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া ছাড়া উত্তম কিছুই মা-বাবা সন্তানদের দান করতে পারেন না।" পিতা-মাতাকে সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। পিতা-মাতার নিকট সন্তানের এটা মৌলিক অধিকার। পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে দীনী শিক্ষা দান করে দীনী চরিত্র গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান, আদব কায়দা অর্থাৎ ইসলামের ভিত্তিতে মুসলমান বানানোর প্রচেষ্টা করতে হবে বাবা-মাকেই।

সন্তানের প্রতি ন্যায়বিচার

নবী করীম (স) বলেছেন, "তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো। তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো। তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।"–মুসনাদে আহমদ

মেয়ে হোক কিংবা ছেলে হোক সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করতে হবে। বাবা-মা কারো প্রতি ঝুঁকে পড়বে না, কাউকে বেশি দেবে না, আবার কাউকে বঞ্চিত করবে না। তাদেরকে পক্ষপাতহীন নীতি অবলম্বন করতে হবে। এ সম্পর্কে একটি মশহুর ঘটনা রয়েছে। প্রায় সবগুলো সহীহ হাদীস গ্রন্থে নুমান ইবনে বশীরের বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

হযরত বশীর আনসারীর স্ত্রী উমরাহ তার পুত্র নুমান ইবনে বশীরকে একটা বাগান বা ক্রীতদাস দান করার জন্যে স্বামীকে পীড়াপীড়ি করেন। এতে হযরত বশীর ঐ ছেলেকে তা দান করেন। কিন্তু নুমানের মা (এ দানকে পাকা পোক্ত করার জন্যে) রাসূলে করীম (স)-কে সাক্ষী রাখার দাবি করেন। সে মতে তিনি নুমানকে সাথে নিয়ে নবী (স)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আমার স্ত্রী উমরাহর গর্ভজাত এ পুত্রকে (নুমানকে) একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু উমরাহ এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তখন নবী করীম (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তোমার সব ছেলেকে দান করেছো ? তিনি বললেন ঃ জী-না। এতে নবী করীম (স) বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় করো। সন্তানদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করো। আমি এ যুলুমের সাক্ষী হতে পারবো না। অতপর হযরত বশীর ফিরে এসে দান ফেরত নিলেন।"-বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ।

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

মানুষের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তার অধিকার আদায় করা। আল্লাহ ও রাসূলের পরেই মানুষের ওপর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার অধিকার। মানুষের সর্বাধিক সহযোগিতা ও সেবা-যত্ন পাবার অধিকারী হলেন তাদের মা ও বাপ । মা-বাপের সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। পিতা-মাতার এ অধিকার সম্পর্কে কুরআন

ও হাদীসে ব্যাপক বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। তাই এ পর্যায়ে কুরআন হাদীসের কতিপয় উদ্ধৃতি পেশকরা হচ্ছে মাত্র ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○ - بنى اسرائيل : ٢٣-٢٤

"তোমার আল্লাহ ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না। পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমার নিকট যদি তাদের কোনো একজন কিংবা দুজনই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ! পর্যন্ত বলবে না। তাদের ভর্ৎসনা করবে না। বিশেষ সম্মানের সাথে তাদের সাথে কথা বলবে। তাদের সম্মুখে নম্র ও বিনয়াবনত থাকবে। আর তাদের জন্যে দোয়া করতে থাকবে ঃ প্রভু! তাদের প্রতি রহম করো যেমন করে তারা বাল্যকালে আমাকে পরম স্নেহ ও মমত্ববোধের সাথে পালন করেছেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪

সূরা আহকাফে বলা হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط

"আমরা মানুষকে তাকীদ করেছি, তারা যেনো পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করে তাকে প্রসব করেছেন।"

–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫

সূরা আন নিসাতে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ

"তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬

সূরা লুকমানে বলা হয়েছে ঃ

পিতা-মাতা যদি মুশরিকও হয় তবু তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। তাদের কষ্ট ভোগের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কেবল মাত্র তাদের শিরকের প্রতি আহবানকে বর্জন করতে হবে।

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ○وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز

"আমার শোকর আদায় করো আর তোমার পিতা-মাতার। তারা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে তোমার ওপর জোর প্রয়োগ করে যে বিষয় তোমার কিছুই জানা নেই, তাহলে তাদের আনুগত্য করবে না। কিন্তু ইহজীবনে তাদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে।"

–সূরা লুকমান ঃ ১৪-১৫

সূরা আনকাবুতের অষ্টম আয়াতেও এ একই কথা বলা হয়েছে।

এবার এ সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর কতিপয় বাণী উদ্ধৃতি করছি।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে রাসূলে খোদা (স)-কে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাল ব্যবহার পাবার সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করল ঃ তারপর ? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে বলল ঃ তারপর কে ? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জানতে চাইলো তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা।–বুখারী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ

"আমি নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় আমল কি ? তিনি বললেন ঃ সময় মত নামায আদায় করা। আমি বললাম ঃ তার পর কি ? তিনি বললেন ঃ মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। আমি বললাম ঃ অতপর কোন্ আমল ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ পথে জিহাদ করা।"

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে নবী করীম (স) কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নবী করীম (স) পিতা-মাতাকে জান্নাত ও জাহান্নাম লাভের মাধ্যম হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"সে ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্য ! সে ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্য ! সে ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্য ! জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার দুজনকেই বা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও জান্নাতবাসী হতে পারলো না।"–মুসলিম

তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

"পিতা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম।"–মুসনাদে আহমদ

কোথাও বলেছেন ঃ

"তোমার পিতা-মাতা তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।"

পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ। রাসূল (স) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তির নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়াও কবীরা গুনাহ্।"

সন্তানের উপার্জনে পিতা-মাতার হক আছে।

"নবী করীম (স) বলেছেন, পিতা-মাতা, সন্তান উত্তম উপার্জন বিশেষ। সুতরাং হে পিতা-মাতা ! তোমরা সন্তানের সম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে পানাহার করো।"–মুসনাদে আহমদ

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাঁদের প্রতি সন্তানের কোনো কর্তব্য এবং সন্তান কর্তৃক তাদের কল্যাণকর কিছু করার থাকে কিনা—এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে নবী করীম (স) বলেন ঃ

"হ্যাঁ, তাদের মৃত্যুর পরও চার পন্থায় তাদের প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করতে পারো এবং তাদের কল্যাণ করতে পারো। (১) তাদের জন্যে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, (২) তাদের কৃত ওয়াদা ও অসিয়ত পূর্ণ করে, (৩) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করে এবং (৪) তাদের সূত্রে যারা তোমার আত্মীয় তাদের সাথে স্থায়ী সুসম্পর্ক রেখে।"

–আদাবুল মুফরাদ

সন্তান পালনে আল্লাহ এবং তার রাসূল (স) যেসব মূলনীতি দিয়েছেন, এতক্ষণ সেই সব নীতিমালা এবং সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এসব মূলনীতিকে সামনে রেখে এখন আমরা একটি শিশুর উপর পরিবার ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবো।

পরিবার ও পরিবেশের আদর্শ

শিশুদের লালন-পালন ও পরিবর্ধনে পরিবার ও পরিবেশের প্রভাব আলোচনার আগে পরিবার এবং পরিবেশের আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার।

ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদির কারণে বিভিন্ন পরিবার ও পরিবেশের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষ তার

নিজের মনমগজ দিয়ে বিভিন্ন আদর্শের জন্ম দিয়েছে। এ কারণেও দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মতবাদ ও আদর্শ চালু রয়েছে। আর বিভিন্ন মতাদর্শের পরিবার ও পরিবেশে লালিত শিশুও বিভিন্ন চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠেছে। তাই দেখা যায়—আস্তিক এবং নাস্তিক পরিবার ও পরিবেশে লালিত শিশু একই রকম ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠে না। ধনী এবং দরিদ্র, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, শহুরে এবং গ্রামীণ পরিবেশের শিশুগণও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠে।

মানুষের সৃষ্ট আদর্শ নির্ভেজাল নয়

মানুষ তার মনমগজ দিয়ে যে মতবাদ বা আদর্শ সৃষ্টি করেছে তা নির্ভেজাল এবং কলুষমুক্ত নয়। কারণ মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মাত্র। মানুষের অক্ষমতা, দুর্বলতা ও বুদ্ধি বিবেচনার সসীমতা তাদের সৃষ্ট মতবাদে প্রকট হয়ে ওঠে। তাই মানব-তৈরী মতবাদ চিরত্রুটি পূর্ণ। তা কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, কারণ মানুষ নিজেই সম্পূর্ণতা অর্জন করতে অক্ষম। তাই দেখা যায় যে মানুষের সৃষ্ট মতবাদের অধীন কোনো নীতিকে কিছু লোক ন্যায় বলে মেনে নিলেও অন্যখানের লোক তা অন্যায় বলে দোষারোপ করে। আবার কখনো বা নিজেদের সৃষ্ট নীতি নিজেরাই প্রত্যাখান করে অন্যায় বলে। মানুষের সৃষ্ট-নীতি এক সময় এক পরিস্থিতিতে যা ন্যায়, অন্য সময় অন্য পরিস্থিতিতে তা কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে।

আল্লাহর দেয়া আদর্শই কেবল নির্ভেজাল

বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহর দেয়া মতবাদ একমাত্র নির্ভুল এবং নির্ভেজাল মতবাদ। সমগ্র বিশ্বজাহান আল্লাহ্ তাআলার সামনে বর্তমান। তিনি সব দেখেন সব জানেন। আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানের শেষ নেই। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত আল্লাহর জ্ঞানের সামনে উন্মীলিত। আল্লাহর নিজের কোনো অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা যিনি এ বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই সারা বিশ্বের মানুষের জন্য তিনি যে জীবনাদর্শ দিয়েছেন তা মানবতার জন্য একমাত্র কল্যাণকর, সর্বকালের গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। এটা সার্বজনীন এবং চির শাশ্বত আদর্শ। ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, অর্থনৈতিক যে কোনো ক্ষেত্রে এ আদর্শের প্রভাব এক অভিন্ন এবং চিরন্তন। শুধুমাত্র সমাজবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের নীতিমালার অনুশীলন সুন্দর মানুষ গড়ে তুলতে পারে না বা শুধুমাত্র এগুলো অনুশীলন করেই সুন্দর ও ভাল মানুষ

হয়ে গড়ে ওঠা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছে যেসব দেশে, সেইসব উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালেও দেখা যায়, সভ্যতার নামে সেখানে অসভ্যতা বিরাজ করছে, "আইয়ামে জাহেলিয়াত" তাদের গ্রাস করে রেখেছে। কারণ তাদের 'আদর্শ' মানুষের মন-মগজ প্রসূত। তাদের নীতি নির্ভেজাল ও কলুষমুক্ত নয়। তাই সমাজ বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানীদের 'ফর্মূলা' শিশুর পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলেও দেশ এবং জাতিকে সত্যিকারের সৎ এবং সুন্দর মানুষ এবং আদর্শ সমাজ উপহার দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামী আদর্শের অনুশীলনই সুন্দর মানুষ গড়ে তুলতে পারে

কেবলমাত্র সার্বজনীন আদর্শ ইসলাম যে নীতিমালা দিয়েছে তার মধ্যে কোনো বিভিন্নতা নেই। যে কোনো অঞ্চল, যে কোনো ভাষা বা বর্ণের মানুষই হোক না কেন আদর্শ যদি তাদের এক ও চিরন্তন হয় তাহলে তার প্রভাব একইরূপ হবে নিসন্দেহে। শিশু যেমন সুন্দর হয়ে জন্মগ্রহণ করে, যদি নির্ভেজাল সার্বজনীন আদর্শের অধিকারী, পরিবার ও পরিবেশে লালিত হয়, বাবা-মা তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করেন তাহলে সুন্দর শিশু সুন্দর মানুষ হয়ে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তাই শুধু প্রয়োজন ইসলামী নীতিমালার আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ এবং শিশুর লালন-পালন ও পরিবর্ধনে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দেয়া নিয়মাবলীর সমন্বয় সাধন। তাহলেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সহজতর এবং সম্ভব হতে পারে।

গর্ভে সন্তান আগমন ও মা-বাবার আকাঙ্ক্ষা

গর্ভে সন্তান আসার সময় থেকেই সব বাবা-মা আল্লাহর কাছে কামনা করতে থাকে—তার সন্তান যেন কানা, খোড়া, অন্ধ না হয়, কোনো বিকলাঙ্গ দেহের অধিকারী না হয়। আল্লাহ যেন তার সন্তানকে সুন্দর সুশ্রী করে দেন। এটাই সকল মা-বাবার মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে।

দাম্পত্য জীবনের এ সপ্নীল দিনগুলো কেমন করে কেটে যায় তা হিসেব করে মিলানো যায় না। নবাগত সন্তানের কি নাম রাখবে তাও স্বামী-স্ত্রীর আলাপনে স্থান পায়। সন্তানের জামা-কাপড় বিছানা বালিশ ইত্যাদি সাজ সরঞ্জামাদিও যোগাড় করে রাখে। লাজভরা চোখে-মুখে আনন্দের যে বন্যা বয়ে যায় তা কারো চোখকেই ফাঁকি দেয় না।

এমনিভাবে একদিন, দুদিন, একমাস, দুমাস করে প্রায় ১০ মাস পর স্বামী-স্ত্রীর কোল আলোকিত করে যখন শিশুর আবির্ভাব ঘটে তখন সর্বপ্রথম তার মুখে দেয়া হয় মধু, কানে শুনানো হয় আযানের ধ্বনি। মধু মিষ্টির প্রতীক—আর মিষ্টি হলো জীবনের সর্বপ্রকার সুকৃতির প্রতীক । আযানের ধ্বনি হলো তার আদর্শের প্রতীক। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্ব ও আদর্শের কথা শিশুর কানে শুনানো হয়। নবাগত শিশুর দুনিয়া সার্বিক জীবন ভালো আচরণের মাধ্যমে সুন্দর হোক, আল্লাহ তাআলার দেয়া বিধান এবং নবী (স)-এর দেখানো পথে শিশু তার ভবিষ্যৎ জীবনকে চালিয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত করে গড়ে তুলুক। এটাই মিষ্টি মুখ এবং আযানের ধ্বনির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গর্ভস্থ শিশুর ওপর মায়ের প্রভাব

মাতৃগর্ভে যখন শিশু বাড়তে থাকে, তখন প্রত্যক্ষভাবে সেই ভ্রূণ বা শিশুকে সাহায্য হয়তো করা যায় না, কিন্তু মায়ের ওপর অনেক দায়িত্ব তখন থেকেই অর্পিত হয়। মায়ের স্বাস্থ্য, মায়ের খাওয়া দাওয়া, মায়ের পুষ্টিহীনতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি গর্ভস্থ সন্তানের ওপর প্রভাব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম যুক্ত খাদ্য গর্ভবতীর জন্য অতন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ গর্ভস্থ সন্তানের জন্য তা অতীব কল্যাণকর। সন্তানের স্নায়ুর সাথে মায়ের স্নায়ুর সংযোগ না থাকলেও মায়ের মানসিক প্রতিক্রিয়া সন্তানের ওপর প্রতিফলিত হয়। গর্ভস্থ ভ্রূণের সাথে মায়ের দেহ ও মনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক মাকে স্বীয় স্বাস্থ্য ও মন উভয়কেই সুস্থ রাখতে হবে। গর্ভবতী নারীর চালচলন, চিন্তা, বিশ্বাস, গতিবিধি ও চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে তার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর। এ সময় গর্ভবতী মা যদি নিলর্জ্জ ও বেহায়াভাবে চলাফেরা করে, অশ্লীল কাজকর্ম করে বেড়ায়, উচ্ছৃংখল আচরণ করে, তাহলে তার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর অনুরূপ প্রভাবই পড়তে পারে। আর মা যদি চরিত্রবান, সৎকর্মশীলা, সুশৃংখল হয় তাহলে তার কাঙ্ক্ষিত সন্তানও সচ্চরিত্রবান হতে পারে। কোনো অবস্থাতেই মার উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। এ সময় প্রত্যেক মায়ের মহামানবদের জীবনী এবং ভাল ভাল বইপুস্তক পড়া উচিত। প্রশ্ন হলো যে, 'মা' গর্ভে সন্তান ধারণ করে বেহায়ার মত নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়ায়, যে 'মা' গর্ভে সন্তান নিয়ে ব্লু ফিল্ম দেখে, যে গর্ভবতী মা স্বামীর অসৎ উপার্জন খেয়ে শরীরে মেদ, গোশত, রক্ত বৃদ্ধি করে, যে মা পর পুরুষের সাথে চলতে ফিরতে দ্বিধা করে না, যে মা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, যে মা কুরআন তেলাওয়াত

করে না, যে মা'র মন পাপ চিন্তায় কলুষিত থাকে, তার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর কি প্রতিক্রিয়া হবে তা চিন্তা করে দেখা দরকার। মনে মনে ছেলে বা মেয়ে ভাল মানুষ হওয়ার চিন্তা বা আশা যতই করা হোক না কেন বাস্তবে বাবা-মা যদি তার বিপরীত কাজ কর্ম করতে থাকে তাতে প্রত্যাশিত ফল লাভ হতে পারে না।

মা যদি মহামানবদের জীবনী পড়ে, কুরআন অধ্যয়ন করে, নামায আদায় করে, রোযা পালন করে, সত্য কথা বলে, ভাল চিন্তা করে, মন প্রফুল্ল রাখে, হালাল রিযিক খায়, সদাচারণ করে তাহলে তার প্রভাব ভাল হওয়াই স্বাভাবিক।

একজন মনীষী বলেছেন, "If you give me a good mother, I shall give you a good nation" গর্ভধারিণী মা'র ভূমিকা তাই নিতান্তই মুখ্য। তাই বলে বাবার ভূমিকা গৌণ নয়। গর্ভবতী মা'র ভাল কাজ করার, ভাল এবং হালাল রিযিক খাওয়া এবং প্রফুল্ল মন মানসিকতা থাকার পেছনে একমাত্র সহায়ক শক্তি হলো পিতা। পিতাকেই এ ক্ষেত্রে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। হাল ধরে নৌকা চালাতে হবে সঠিক পথে।

গৃহের পরিবেশ ও পরিবার

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথমেই যে পরিবেশে লালিত হয়, তাই হলো গৃহ-পরিবেশ। গৃহ-পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-ভালবাসা, প্রীতি, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী, আলো-বাতাস ইত্যাদি। অসহায় শিশুর জীবনে গৃহের পরিবেশ যে প্রভাব বিস্তার করে তাই তার জীবনে স্থায়ী হয়। শিশু তার জীবন দর্শন খুঁজে পায় গৃহের পরিবেশেই।

গৃহের পরিবেশের মধ্যে শিশুর লালন-পালন এবং তাকে একটি সুন্দর মানুষরূপে সমাজে গড়ে তোলার জন্য মা-বাবার ভূমিকা সবচেয়ে বড়।

জন্ম লাভের পর থেকেই শিশুর সামাজিক জীবনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শিশু কেঁদে ওঠে। শিশুর কাঁদা-হাসা, হাত-পা নাড়া ইত্যাদি এক একটি ভিন্ন আচরণের বহিঃপ্রকাশ। শিশুকে খাওয়ানো, কোলে নিয়ে আদর করা, সোহাগ করা, কথা বলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুর ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে যা তাকে আরাম এবং পরিতৃপ্তি এনে দেয়।

মাসেন, কনগার এবং ক্যাগন এ তিনজন মনোবিজ্ঞানী শিশুর সামাজিক আচরণের বিকাশ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করেন। তাদের মতে, "Early

learning experiences about people are in part built upon the complex sensory experiences that are associated with feeding. The feeding sitnauion is a social one in which fundamental attitudes towards the mother are formed."

খাওয়ার সময় যে সমস্ত শিশু মায়ের আদর যত্ন ও স্নেহ-মমতা পায় না এবং মায়ের অবহেলা ও বিরক্তি অনুভব করে তাদের মধ্যে ক্ষুধামন্দা, অসামাজিক মনোভাব এবং মারামারি করার প্রবণতা বেশী দেখা দেয়। সাধারণত দুমাস বয়স থেকেই শিশুর মধ্যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শিশুর বয়স যখন ২/৩ মাস হয়, তখন শিশু জড় এবং অচেতন পদার্থ থেকে নিজেকে পার্থক্য করতে শেখে। তাই শিশু কখনো একা থাকলে সে অসহায় বোধ করে। ৪/৫ মাস বয়স কালে শিশু পরিচিত এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। শিশুর সামনে এ সময় কোনো পরিচিত ব্যক্তি এলে সে খুশী হয়, হাসে, কোলে উঠতে চায় এবং আদর স্নেহ পেতে চায়। ৬/৭ মাসের শিশু মায়ের মুখের ভাবভঙ্গি, মেজাজ প্রকৃতি ইত্যাদি মানসিকতা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। ৮/৯ মাস বয়সে শিশু অন্য শিশুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে, এবং তাকে ধরতে চায়। ৯/১০ মাসের শিশু অন্যের অঙ্গভঙ্গি ও স্বরধ্বনি নকল করতে চায়। ১৩/১৪ মাসের শিশু অন্য শিশুর সাথে মিলেমিশে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৪/১৮ মাসের শিশুরা হাতের খেলনা ফেলে দিয়ে পাশের শিশুর প্রতি মনোযোগ দেয় এবং ১৯/২৫ মাসের শিশুরা খেলনার সামগ্রী নিয়েই অন্য শিশুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রয়াস পায়। এখানে উল্লেখ্য, দু বছর বয়সের সময় থেকেই শিশুর মধ্যে আত্মসচেতনতা ও স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হতে থাকে। এ সময় বড়দের শাসন ও ধমকের প্রতি শিশুরা বিদ্রোহ প্রদর্শন করে। আড়াই বছরের শিশুর মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন সুশৃংখলভাবে প্রতিভাত হয়। এ সময়েই শিশুকে দৈহিক, মানসিক ভাষা, অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে দেখা যায়। শিশুর মধ্যে এই সময় যে বোধের সঞ্চার হয় মনোবিজ্ঞানী Erikson তাকে Sense of autonomy বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মা-বাবা শিশুর কোনো কিছু করা বা না করাকে যখন বাধা প্রদান করেন তখনই শিশু কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য আর কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য নয় বা অপ্রীতিকর সে সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করতে থাকে। শিশুর কোনো কাজে মা-বাবার আদর সোহাগ একদিকে উৎসাহ যোগায় এবং কোনো কাজের ধমক, শাসন বা তিরস্কার শিশুকেই সে কাজ করতে নিরুৎসাহিত

করে। এমনিভাবে পরিবার এবং মা-বাবার প্রভাবেই শিশুর ভেতর বিশেষ মূল্যবোধ, অভ্যাস ও মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তাই গৃহের পরিবেশ শিশুর জীবনে প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র। শৈশব কালে গৃহের পরিবেশের যে প্রভাব শিশুর উপর পড়ে তার ফলেই পরবর্তীতে তার জীবন গড়ে ওঠে। বাবা-মা'র মধুর সম্পর্ক সন্তানদেরকে স্বভাবী হতে সহায়তা করে। অন্যদিকে যে মা-বাবার মধ্যে কলহ্ থাকে তার ফলে শিশুর ব্যক্তিত্বের ওপর যথেষ্ট বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। মা-বাবার কাছে যে স্নেহ-মমতা পায় না, সে শিশু অন্য লোকদের কাছে স্নেহের জন্য লালায়িত থাকে। এভাবে শিশু অনেক সময় মা-বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে সমাজ বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হয়। এভাবেই কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা জন্ম নেয়।

অন্য দিকে বাবা-মা, ভাই-বোনদের সাথে মধুর সম্পর্ক এবং পরিবারের স্নেহ ঘেরা পরিবেশ একটি শিশুকে সুন্দরভাবে বিকশিত করে তোলে। মা-বাবার প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবোধই পরবর্তীকালে সামাজিক অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়।

অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে, বাবা-মার প্রত্যাখ্যানের ফলেই শিশুর মধ্যে অপরাধ প্রবণতার জন্ম নেয়। বাবা-মা যদি শিশুকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে শিশু বড় হয়ে তাদের প্রতিও এরূপ মনোভাব পোষণ করে।

Hurlock বলেন ঃ

The parent-child relationship is thus greatly influenced by the way children perceive the training and the interpretation they place on the parent's motivation for punishment.

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশু যদি বাবা-মাকে একবার উপেক্ষা করার সুযোগ পায় তাহলে পরে বাবা মা'র শত অনুনয় বিনয় কোনো কিছুই সে আর শুনে না। এসব ছেলেমেয়েরাই বড় হয়ে বাবা-মা'র কাছে কিছু আদায় করার জন্য অসামাজিক আচরণ প্রদর্শন করে।

বাবা-মা'র সঙ্গ ও পরিচালন নীতি

পরিবারে বাবার অনুপস্থিতিতে ছেলেরা নির্ভরশীল, অপরিণত, কলহ প্রবণ হয়ে ওঠে। বাবার সঙ্গ ও পরিচালনা শিশুর মধ্যে নৈতিকবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। শিশুর সাথে সময় ব্যয় না করা, স্নেহ-মমতা প্রদর্শন না করা, শিশুর প্রতি বাবা-মা'র কড়া শাসন এবং বাবা-

মা'র শিশুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব শিশুদের ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

শিশুকে সুস্থ্য, দায়িত্বশীল, নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন এবং সমাজের একজন উপযোগী ব্যক্তিত্বে গড়ে তুলতে হলে পরিবারে বাবা-মা'র উপস্থিতি প্রয়োজন। বাবা-মা'র উপস্থিতি যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত মায়ের উপস্থিতি এবং স্বতস্ফূর্ত এবং স্নেহ-মমতার একান্ত প্রয়োজন।

Baley এবং Sehaffer এ দুজন খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, মায়ের যত্ন ও স্নেহ মমতায় ছেলেরা বেশী লাভবান হয় এবং বেশী অনুপ্রাণিত হয় আর মেয়েরা মায়ের উৎসাহ ও স্বাধীনতায় উন্নতি করে থাকে। তারা আরো দেখিয়েছেন যে, মায়ের কঠোরতা শিশুর I.Q বৃদ্ধিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বাবার চেয়ে মায়ের প্রশংসা অনুমোদন ও স্বাধীনতা শিশুর সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করে।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ Skinner বলেন যে, বলবর্ধনের দ্বারা শিশুকে সঠিক ব্যবহার ও আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা সহজ। অর্থাৎ বকাঝকা বা জোর জবরদস্তি কিংবা মৌখিক অনুমোদনের চুক্তি শিশু কিশোরেরা যেমন বুঝতে পারে—তেমনি অনুপ্রাণিতও হয়। তবে পুরস্কার নির্বাচনের সময় বাবা-মা অর্থাৎ যারা বড় তারা যেন তাদের আর্থিক সঙ্গতির কথা মনে রেখেই তা করেন। কোনো অবস্থাতেই শিশু যেন তাদেরকে পুরস্কার সংগ্রহে বাধ্য না করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিশু ও মা-বাবার মধ্যে যে সম্পর্ক তা হলো reciprocal অর্থাৎ বিপরীত মুখী। বাবা-মা'র আচরণ যেমন শিশুর ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে তেমনি শিশুর আচরণ এবং বাবা-মা'র প্রতি তার প্রতিক্রিয়া বাবা-মাকে প্রভাবিত করে। মা-বাবার অনাদর, অবহেলা একটি শিশুকে বিমর্ষ ও হতাশাগ্রস্ত করতে পারে, অন্যদিকে অমিশুকি এবং অন্তর্মুখী স্বভাবের শিশুর মা-বাবাও শিশুকে অবহেলা ও উপেক্ষা করতে পারে। তাই শিশু লালন-পালন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

অধিকাংশ শিশু পরিবারে মায়ের অনুপস্থিতিতে অসুখী হয়। বাবা-মা'র চাকুরী এবং কাজকর্ম পারিবারিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। অনেক কিশোর-কিশোরী যখন মনে করে যে, বাবার পেশা ও আর্থিক অবস্থা তার বন্ধুদের অবস্থার সমতুল্য নয় তখন বাবা-মাকে তারা সমালোচনা করতে আরম্ভ করে। কিশোর-কিশোরীরা যখন দেখে যে, তাদের বাবা-মা তাদের

খোঁজ খবর ঠিকভাবে নেয় না, তাদেরকে যথেষ্ট সঙ্গ প্রদান করে না, তাদের মা-বাবা অন্যত্র সময় কাটান, ক্লাব রেস্তোরায় আড্ডা দেন, মা-বাবা উভয়ই চাকুরীতে অধিক সময় ব্যস্ত থাকেন কিংবা সন্তান সন্ততির দিকে খেয়াল না রেখে কোনো আদর্শ প্রচারে নিমগ্ন থাকেন তখন সেই সব কিশোর-কিশোরীদের মনে স্নেহ বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত ভাব তীব্রভাবে জাগ্রত হয়। এ স্নেহ বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত অনুভবই শিশুকে ধীরে ধীরে অসামাজিক আচরণ করতে ঠেলে দেয়, বাবা-মা'র প্রতি এবং তাদের আদর্শের প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে।

শিশুকে সঠিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যখন আদেশ, অনুরোধ, চুক্তি বা পুরস্কার কোনোটাই কাজে লাগে না তখন কিছুটা শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তবে একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র অপ্রীতিকর আচরণের কারণেই শিশুকে শাস্তি দেয়া উচিত। শিশুর সম্মান এবং ব্যক্তিত্ব কোনো অবস্থায় ক্ষুণ্ন না হয় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে যে কারণে শিশুকে শাস্তি দেয়া হয় তা যেন শিশু বুঝতে পারে। আবার শিশুকে শাস্তি দিয়ে বাবা-মা যদি অনুশোচনা করে— তাহলে সে শাস্তিতে কোনো কাজ হয় না।

শিশুকে কথায় কথায় ভয় দেখানো উচিত নয়। শিশুকে এমন কোনো কথা বলা বা ওয়াদা করা ঠিক নয় যা কার্যত পালন করা সম্ভব নয়। "তোমাকে মেরে শেষ করে ফেলবো," "তোমাকে বেঁধে রাখবো" "তোমাকে ঘরে ঢুকতে দেবো না" ইত্যাদি কথা বলে কার্যত তা না করা হলে শিশু পরবর্তীকালে এসব কথার কোনো গুরুত্বই দিবে না। অন্যদিকে শিশুকে যদি বলা হয় যে, "তুমি যদি সকালে ঘুম থেকে উঠো তাহলে বিকালে তোমাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবো" কিন্তু বিকালে বাবা-মা শিশুকে নিয়ে পার্কে সে দিন গেল না, তাহলে শিশু বাবা-মা'র কথা ও কাজে অমিল দেখতে পেল তা সারাজীবন চেষ্টা করেও এবং এর বদলে অন্য কয়েকদিন পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেলেও তার মন থেকে প্রতিক্রিয়া দূর করা যাবে না। বরং সে ভাববে বাবা-মা মিথ্যে কথা বলে ফাঁকি দেয়। এসব দেখে সেও অনুরূপ কাজ করতে শিখবে তার পরবর্তী জীবনে।

আল্লাহর রাসূল বলেছেন ঃ

"কৌতুকছলে ও গৌরব প্রদর্শন কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা সমিচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে এমন কোনো ওয়াদা করবে না যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না।"

শিশু কিশোরের খেলার সাথীরা যখন সকলেই খেলতে বের হয় তখন আবার তাকে শাস্তি স্বরূপ ঘরে আটকিয়ে রাখাও ঠিক নয়। এরূপ অবস্থায় শিশু কিশোরের মধ্যে লুকিয়ে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা বাড়বে এবং বাবা-মা'র ওপর মনক্ষুণ্ণ হবে।

প্রত্যেক মা-বাবাকে তার সন্তানের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিশুর বয়স অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং সুসম্পর্ক রাখতে হবে। কোনো মা-বাবা যদি তার এক বছরের শিশু সন্তানকে প্রশ্রাব বা পায়খানা চেপে রাখতে বলে কিংবা চার বছরের বয়সী শিশুকে দুই ঘন্টা বা ১ ঘন্টা চেয়ারে চুপ-চাপ বসে থাকতে বলে তা কি সম্ভব—না তা বাস্তাবতা বিবর্জিত। কাজেই সন্তান লালনে শিশু প্রকৃতির ওপর জ্ঞান থাকতে হবে এবং যেসব সমস্যাজনিত আচরণ স্বাভাবিক বয়সের কারণে হয় সেগুলো উপেক্ষা করতে হবে।

সন্তানকে চরিত্রবান এবং সুনাগরিক ও সুস্থ্য ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে তুলতে হলে পরিবার অর্থাৎ মা-বাবাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে—

১. বাবা-মা যে নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করবেন তার প্রতি অটল এবং অনড় থাকবেন। এতে শিশু বাবা-মা'র অবিচল নীতি আদর্শকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে এবং নিজেও আদর্শবাদী হয়ে উঠবে।

২. বাবা-মা তাদের কথায় এবং কাজে মিল রাখবেন। প্রত্যেক মা-বাবাকে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুকে যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা যেন শিশু পালন করে। প্রয়োজনে এসব ক্ষেত্রে যুক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার প্রশ্রয় নিতে হবে।

৩. শিশু কিশোরদের বয়সানুযায়ী পরিচালন পদ্ধতি প্রয়োগ করা দরকার। শিশুদের তুলনায় বয়প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতার প্রয়োজন বেশী। শুধু তাই নয় শিশুদের ক্ষেত্রে যে শাস্তি দেয়া যায় বড় ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে না।

৪. মা-বাবাই শিশুদের সামনে একমাত্র আদর্শের প্রতীক। তাই বাবা-মা শিশুকে অর্থাৎ সন্তানকে যদি আদর্শবান, সামাজিক, সত্যবাদী অর্থাৎ একজন ভাল এবং সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান তাহলে বাবা-মাকেও আদর্শবান, সামাজিক এবং সত্যবাদী হতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাবা-মা সন্তানকে বলছেন, সদা সত্য কথা বলবে—কারণ মিথ্যা বলা মহাপাপ। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল দরজায়

এসে একজন কড়া নেড়ে ডাকলো। তার সন্তান বের হয়ে বললো, কাকে চান, আগন্তুক উত্তরে তার বাবাকে চাইলো। সন্তান ঘরে ফিরে বাবাকে বললো, "আব্বু তোমাকে ডাকে।" আব্বু বলে দিল, "গিয়ে বলো আব্বু বাসায় নেই।" সেই সন্তান তখন সত্য কথা বলতে শেখবে না। বরং বাবার কাছে মিথ্যে কথা বলার ট্রেনিংই রপ্ত করতে শিখবে।

সন্তান মা-বাবার কাছে বায়না ধরলো, "মা আমাকে সাইকেল কিনে দাও।" মা বললো এ মাসে টাকা নেই বাবা। কিন্তু সে মাসেই যদি মা একটি নতুন শাড়ী কিনেন তাহলে সন্তান মা-বাবাকে অবিশ্বাস করতে শেখাই স্বাভাবিক।

শিশু কিশোর তার মা-বাবা যে আর্থিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বড় হয় হঠাৎ যদি তাতে কোনো পরিবর্তন দেখে তাহলে শিশু-কিশোরের মনে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ধরা যাক একটি শিশুর বাবা একজন কারনিক বা একজন কর্মকর্তা। শিশু বড় হয়ে জানতে পারে তার বাবার আয় কত? কিন্তু বাবা যদি তার আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করে তাহলে তার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কি করে এত খরচ করা সম্ভব হয়। মা বা অন্য কেউ কোনো এক সময় বলে দিল 'উপরি' আয় আছে। উপরি কি তাও সে জানতে পারলো, বুঝতে পারলো। এ সন্তানকে যতই নীতিকথা শুনানো হোক বা যতই ভাল মানুষ হবার শিক্ষা দেয়া হোক—সে যদি বড় হয়ে অসৎ উপার্জনে লিপ্ত হয় তার জন্য তো দায়ী তার মা-বাবাই।

ছোট বেলা থেকেই বাবা-মাকে তাদের সার্বিক আচার আচরণের মধ্য দিয়ে শিশুকে কোন্‌টি ন্যায় কোন্‌টি অন্যায় এ বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। তবে মনে রাখাতে হবে ৩/৪ বছরের সন্তানের সামনে লম্বা আদর্শের বুলি অর্থহীন। সংক্ষিপ্ত দু এক কথায় সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায় বুঝাতে হবে। সর্বোপরি যা মা-বাবাকে করতে হবে তাহলো মা-বাবার জীবনে বাস্তবভাবে আদর্শ, সত্যবাদিতা এবং ন্যায়নিষ্ঠার প্রতীকরূপে সন্তানের সামনে নিজেদেরকে পেশ করা এবং সেভাবে তাদের গড়ার যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। তাহেল হয়তো আস্তে আস্তে মা-বাবার মত সুন্দর হয়ে শিশুও গড়ে উঠতে পারে।

মনো বিজ্ঞানীর ভাষায় ঃ

"A child's social devlopment is rooted in his relationship with his mother in the first two years of life."

যে সকল ছেলেমেয়ে মায়ের স্নেহ, আদর, সোহাগ থেকে বঞ্চিত তারা নানাভাবে মাকে বিরক্ত করে এবং নিজের কাছে মাকে আটকে রাখতে চায়। তবে মা কেন তার সন্তানকে আদর করে না, তারও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। মা যদি সন্তানকে বোঝা মনে করে, অর্থনৈতিক চাপ মনে করে এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মধ্যে শিশুকে একটি সমস্যা মনে করে, তাহলে শিশুর প্রতি তার মনোভাব আদর ভরা না হয়ে বিরক্তিকর হতে পারে। শিশু তার জীবনের প্রথম ৪/৫ বছর পরিবারের মধ্যেই লালিত হয়, তাই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মনোভাব, সামাজিক চাল-চলন, পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি পরবর্তী জীবনে ঘরের বাইরে শিশুকে খাপ খাওয়াতে প্রভাবিত করে।

শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত চালচলনে বাবা-মা'র বাধা প্রধান, শাসন, অবদমন প্রভৃতি যদিও শিশুকে সুবোধ বালকের মত বাধ্য হতে শেখায়—তবুও তার মধ্যে তার উৎসাহ-উদ্যম, সৃজনশীলতার অবলুপ্তি হয়। মনোবিজ্ঞানী Erikson বলেন, "In overprotectiveness. the child is not allowed to experience success in executing a new action and therefore he may be prevented from maturing a decisive selfconfident person."

কড়া শাসন একদিকে ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী করে তোলে, অন্যদিকে বেশী আদর সোহাগ সন্তানদের নির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। তাই বাবা-মা'র মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

বাবা-মা যেসব কাজ-কর্ম করেন ছেলেমেয়ে দেখে শুনে তাই করতে শেখে। তাই বাবা-মা'র এমন সব চাল-চলন, কাজ-কর্ম করা দরকার যেগুলোর প্রভাব ভালো। বাবা-মা তাদের কাজ-কর্মে, চাল-চলনে, খানা-পিনায়, আয়-ব্যয়ে যদি কোনো নৈতিকতা বা Ethics না মানেন—তাহলে তাদের সন্তানাদি তাদের কাজ-কর্ম দেখে-শুনে নীতিহীন কাজকর্মই করতে শিখবে। তারা বাবা-মাকেই সর্বপ্রথম তার জীবনের 'মডেল' হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

যে শিশু মা-বাবাকে নামায পড়তে দেখে সেও মা-বাবার সাথে নামাযে দাঁড়ায়, যে শিশু মাকে বোরখা পড়ে বাসার বাইরে বেরুতে দেখে সেও বোরখা পরতে চায়, যে শিশু বাবা-মাকে অন্যকে সালাম দিতে দেখে সে নিজেও ঘরে কেউ আসলে তাকে ছালাম দিতে শেখে। আযান শুনলেই

ছোট অবুঝ শিশু বলে উঠে আব্বু নামায পড়বে না ? এভাবে সে কিছু গ্রহণ এবং কিছু বর্জন করে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে।

অন্যদিকে যে শিশু-অবুঝ অবস্থা থেকেই নিজ বাসগৃহের দেয়ালে নগ্ন ছবি দেখতে পায়, ঘরে টানানো ক্যালেণ্ডারের অশ্লীল ছবি অবলোকন করে, শোক্যাসে রং বেরং-এর উলঙ্গ মূর্তি দেখে, বাবা, মা, ভাই-বোনকে নামায কালাম না পড়ে ঘুমুতে, গল্পগুজবে বা তাস খেলাতে সময় কাটাতে দেখে, যে শিশু বাবা-মাকে মিথ্যা কথা বলতে দেখে, যে শিশু ছোট থেকেই ভিসিআর, ব্লুফিল্ম, টারজান, পুতুল নাচ ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে সেও এক প্রকার গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তুলে। শিশু অবস্থায় তার মানসপটে যা রেখাপাত করে—পরবর্তীতে তাই বিকশিত রূপ লাভ করে।

পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত, যে শিশু মানব সমাজের বাইরে বনে জঙ্গলে পশুদের মাঝে থেকে লালিত হয়, সে পশুদের স্বভাব প্রকৃতি নিয়েই গড়ে ওঠে, সে কথা বলতে শেখে না—চার পা দিয়ে অর্থাৎ দুই পা দুই হাত দিয়ে হাটতে শেখে, কাঁচা গোশত খেতে ভালবাসে, অন্যদিকে মানবিক পরিবেশে পশুশাবককে লালন পালন করলে সে পশু শাবকও অনেক মানবিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে।

সমাজ বিজ্ঞান এবং মনো বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই জানেন যে, এর প্রমাণ রামু এবং কমলা নামে দুই শিশু যারা বাঘের খাঁচায় পশুর স্বভাব নিয়ে গড়ে ওঠেছিলো এবং অন্যদিকে ডব্লিউ এন এবং এল. এ. ক্যালস এর ছেলে রোনোল্ডের সাথে লালিত হয়ে একটি শিম্পাঞ্জী কিভাবে কিছু মানবীয় গুণ অর্জন করেছিল। এরূপ আরো বহু প্রমাণই রয়েছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে স্বভাব প্রকৃতি আচার ব্যবহার কৃষ্টি ও পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্নতার কারণে শিশুরা বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে গড়ে ওঠে এবং গ্রহণ বর্জনের মানদণ্ডও বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

তাই আজ যে শিশুরা মায়ের কোলে থেকেই অশালীন কোনো কিছুর সাথে পরিচিত হয়, কৈশোরে যারা ভিসিআর, টেলিভিশনে এবং সিনেমার হলে মারদাঙ্গা টাইপের ছবি দেখে, ঘরে অশ্লীল ছবি, পত্র পত্রিকা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করে, পার্টিতে বা বিয়ের মজলিসে কিংবা কোনো উৎসব আয়োজনে অবাধে মেলামেশার নামে বাড়াবাড়ি প্রত্যক্ষ করে, কিংবা পারিপার্শিক উশৃংখল পরিবেশের সাথে মিশে তাদের ওপর এসবের অশুভ

প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। ছোটবেলা থেকে যেসব শিশু-কিশোর বাবা-মাকে অঢেল খরচ করতে দেখে, ঘরে প্রতি মাসেই নিত্য নতুন দামী দামী রং-বেরং-এর পোশাক আশাক দেখে, প্রতিদিনই খাবার টেবিলে অফুরন্ত নামী দামী বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য ভাণ্ডার পড়ে থাকতে দেখে, বাবার হাতে ৫৫৫, বেনসন বা ডানহিল সিগারেট দেখে তাদের মনের পাতায় তখন কি প্রভাব পড়ে তা শিশু কিশোর এবং যুবকরা বুঝতে না পারলেও আমরা আজ সমাজ জীবনে যারা পিতা মাতা তাদের নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করার কথা।

"শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুদের অন্তরে" কবির সেই চিরন্তন এবং শাশ্বত বাণীকে যদি সর্বাবস্থায় সব বাবা-মা মনে রেখে চলেন এবং নির্ভুল একটি মানদণ্ডের আলোকে গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে নিজেরা চলেন এবং তার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তবেই তাদের সন্তানেরা সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠতে পারে।

এখন প্রশ্ন, গ্রহণ এবং বর্জনের নির্ভুল মানদণ্ড কি ? মানুষের মনমগজ প্রসূত ভালমন্দ বা গ্রহণ বর্জনের মানদণ্ড নির্ভুল নয়। এমন কি নীতি শাস্ত্রও ন্যায়-অন্যায়ের বা গ্রহণ বর্জনের যে মানদণ্ড দিয়েছে তাতেও কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়—এক জায়গায় এক সমাজে যা ন্যায়, অন্য জায়গায় এবং অন্য সমাজে তাই অন্যায়।

তাই এ ব্যাপারে নির্ভুল ভারসাম্যপূর্ণ এবং সর্বকালের সর্ব গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড হলো আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (স) প্রদর্শিত ন্যায় অন্যায়ের এবং গ্রহণ বর্জনের মানদণ্ড। আল কুরআনের মানদণ্ডই চিরন্তন এবং শাশ্বত। সব শিশুর বাবা-মা যদি ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল মানদণ্ডের আলোকে ন্যায় ও অন্যায়ের শিক্ষায় গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে নিজেদের জীবন অনুশীলন করেন তাহলে তাদের সন্তনেরাও সেভাবে গ্রহণ বর্জন করা শিখতে পারে এবং নিজেদের সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে।

শিশুর চরিত্র গঠনে গৃহের পরিবেশ ও বাবা-মা'র ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ দায়িত্ব কেবল মাত্র মহান ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমেই সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। যেসব পিতা-মাতা এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে নিজেদের সন্তানদের সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হিসেবে দেখে যেতে পারেন তারা যেমন জীবন সায়াহ্নে শান্তি ও পরিতৃপ্তি পান তেমনি মৃত্যুর পরও সৎ সন্তানের নেককাজের সওয়াবও তারা অব্যাহতভাবে পেতে থাকেন।

স্কুলের পরিবেশ

শুধু মাত্র গৃহের মধ্যেই স্কুল পরিবেশ সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিকতা, মাঠ, বাগান, অফিস, লাইব্রেরী শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, আসবাবপত্র, ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি নিয়েই স্কুল পরিবেশ। শিশুর বয়স যখন বাড়ে, মন যখন উৎসুক হয়ে ওঠে, তখন নিজ গৃহের পরই যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি সেটা হলো বিদ্যালয়। একজন ব্যক্তির বিশাল জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় বিদ্যালয়ে। আর এ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী।

শিশু এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্নেহ ঘেরা পারিবারিক পরিবেশ থেকে আসা একটি শিশু যদি স্নেহ ঘেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানুষ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। শিক্ষকদের কাজ শুধু কয়েকটি ছাপার অক্ষর শিশুকে শেখানো নয়, শিশুকে সুন্দর মানুষ, সামাজিক এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম। কথায় বলে—বাপে জন্ম দেয় ভূত—আর শিক্ষক বানায় পুত।

একথার মর্ম উপলব্ধি করে কাজে তার বাস্তব স্বাক্ষর রাখতে শিক্ষক ব্যর্থ হলে 'ভূত কি পুত' হতে পারবে ?

অনেকে একথা স্বীকার করবেন, শিক্ষক যদি ভুল শিক্ষা দেন তাহলে শিশুর মন থেকে সেই ভুল শিক্ষা দূর করা যায় না। কারণ শিশু তার শিক্ষকের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল হয়ে থাকে। যে শিক্ষক তার ছাত্রের আস্থা অর্জন করতে পারে না তার দ্বারা ছাত্রের তেমন কোনো উপকারের সম্ভাবনা নেই। শিক্ষকের সদা মধুর এবং বিশ্বাসের সম্পর্কেই কেবল ছাত্রকে ফলপ্রসু জ্ঞান দান করতে সহায়ক হয়। যে শিক্ষকের মাঝে স্নেহ, মায়া-মমতা নেই, যে শিক্ষক শুধু শাসন করতে জানে সেখানে শিক্ষালাভের পরিবর্তে তার প্রতি শিশুর মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এরূপ পরিবেশকে শিশু ভয় করে এবং সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয় ও তাদের আদেশ অমান্য করতে শেখে। শিক্ষক এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কারণেই অনেক সুপ্ত এবং সম্ভাবনাময় প্রতিভাকে এভাবে অংকুরেই বিনষ্ট হতে দেখা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরাই সমাজ বহির্ভূত কাজ করতে শেখে। যে শিক্ষকের মধ্যে কোনো আদর্শ নেই, নেই কোনো নীতি-নৈতিকতা—যে শিক্ষকের চাল-চলনে কোনো আদর্শের চিহ্ন পাওয়া যায় না—সেই

শিক্ষকের কাছ থেকে শিশু ভাল কিছু শিখতে পারে না। যেসব বই পুস্তকে কোনো আদর্শের কথা নেই, সে সবের মাধ্যমে শিশু কি জ্ঞান অর্জন করবে? শিশু নিজ বাবা-মা'র পরে শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই IDEAL MODEL মনে করে। তাই আদর, মায়া-মমতা এবং স্নেহ দিয়ে শিশুর দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাকে আদর্শ মানুষ করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব শিক্ষকেরই। সুতরাং বাবা-মাকে তার সন্তানকে স্কুলে দেয়ার আগে চিন্তা করতে হবে আদর্শ বিদ্যালয়ের কথা, ভাবতে হবে আদর্শ শিক্ষকের কথা, ভাবতে হবে আদর্শ পাঠ্যসূচির কথা, ভাবতে হবে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের কথা। সমাজে যদি এগুলো বিদ্যমান থাকে—সেখানেই তার সন্তানকে সত্যিকার সুন্দর মানুষরূপে গড়ার চেষ্টা করতে হবে, নয়তো এসব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে এগুতো হবে।

শিশুর খেলার সাথী

পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে আরেকটি পরিবেশ যা শিশুকে প্রভাবিত করে তা হলো তার খেলার সাথীরা এবং সমবয়সীরা। সমবয়সী অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে মিলে শিশু যা শিখে তা হলো সহযোগিতার মনোভাব। অন্যের সাথে কিভাবে চলতে হয় তা, মূল্যবোধের প্রতি সচেতনতা, যথাযথ সামাজিক মনোভাব ও ভূমিকা অর্জন এবং পিতামাতার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বাধীনচেতা হওয়া। এসব গুণ সমাজ জীবনের জন্য ক্ষতিকর নাও হতে পারে। কিন্তু বিপদ তখন, যখন শিশু অসৎ সংসর্গে জড়িয়ে পড়ে। যখন অসুস্থ, স্নেহ বঞ্চিত পারিবারিক পরিবেশ থেকে আগত ছেলেমেয়েদের সাথে মিশে তখন। স্নেহ বঞ্চিত যেসব শিশুরা নিরাপত্তা বোধ হারিয়ে ফেলে তারাই একত্রিত হয়ে দল গঠন করে এবং বাবা-মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সমাজ বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হয়। শিশুদের স্বভাব এবং ব্যবহার পরিবর্তনে সাথীদের প্রভাব অপরিসীম। তাই বাবা-মাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে কোন্ ধরনের সাথীদের সাথে মেলামেশা করলে তার সন্তান ভাল হয়ে গড়ে ওঠবে।

আজকাল নতুন এক পরিচয়ে কিছু যুবকদের রাস্তাঘাটে দেখা যায় তাদের নাম মাস্তান। মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরাও এ নামের পরিচিতদের ভয় করে। শুনা যায়, এ ধরনের মাস্তানেরা নাকি মাদকদ্রব্যও সেবন করে থাকে। এদের হুমকির মুখে মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও সমাজের সকলেই যেন জিম্মী। শিশু-কিশোরদের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মাসুম নিষ্পাপ একটি কিশোর যাতে এসব নামধারীদের সাথে মিশতে না পারে তার জন্য বাবা-মাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সাথী যদি ভাল না হয় তাহলে তার ক্রিয়া হয় বিষবৎ। তাই সমাজে মানুষ গড়ার আঙ্গিনা কোথায় আছে, মানুষ গড়ার সহায়ক সাথী কারা তাও বাবা-মাকেই খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই সৎ চরিত্রবান সাথীদেরকেই তাদের সন্তানদের সাথী বানাবার উদ্যোগ নিতে হবে। এর ফলে দুটো সুফল অর্জিত হতে পারে ঃ

১. মাস্তানদের প্রভাবমুক্ত হয়ে চলার উপায় (২) সৎ সাথীদের সাথে উঠা বসা, খেলা ধূলা এবং মেলামেশার মাধ্যমে চরিত্রবান নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ।

ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল এবং কিছু করণীয়

সব বাবা-মাকে এমন একটা কাল পেরিয়ে আসতে হয়, যাকে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল। কৈশোরের শেষ পদ এবং যৌবনের সূচনার মধ্যবর্তী সময়টাই এ বয়ঃসন্ধিকাল। সাধারণত ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে এ সময়টা হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় আবহাওয়া ও ভৌগলিক কারণে এ সময়ের তারতম্যও হতে পারে। মোটকথা এই যে, সকল মানুষের জীবনে এ কাল আসে।—এ কাল পেরিয়ে যায়। একালকে বলা যায় যৌবনের উন্মেষ বা বিকাশ-পর্ব।

আমাদের আলোচনা শুধু এ কাল নিয়ে নয়। এ সময়টা একজনের জীবনে কিভাবে আসে—কিভাবে পেরিয়ে যায় এবং জীবন গঠনে কি রেখে যায় তাই নিয়ে।

মনো বিজ্ঞানীদের ভাষায় Adolescent period is the priod of storm and stress. কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বলেছেন, It is the period of identity crisis.

কিশোর-কিশোরী যখন তাদের কৈশোর পেরিয়ে এ কালে পা রাখে, তখন নানা অজানা আকুতিই তার হৃদয়ের পরতে দোলা দেয়। তাদের চিত্ত চাঞ্চল্য বেড়ে যায়। যৌবনের আগমন সম্পর্কে চিন্তা ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভাব দেখা যায়। হাসি-কান্না, উদ্বেগ-কৌতুহল বাড়ে। সহসা অশান্ত কিংবা নিরুপায় ভাবের প্রকাশ ঘটে। আবেগ-উচ্ছ্বাস, উৎসাহ ইত্যাদির আগমন ঘটে।

ঠিক এ মুহূর্তে কিশোর-কিশোরী তাদের অস্থিরতার কারণ বুঝতে পারে না। তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

বুদ্ধদেব বসুর লেখায় এ সময়ের চিত্রটা আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠে। "কি যন্ত্রণা আমার যখন চৌদ্দ বছর বয়সে প্রথম টের পেলাম যে, আমার শরীরের মধ্যে আরেকটি অংশ লুকিয়ে আছে। আমারই অংশ কিন্তু হাত পায়ের মত বাধ্য নয়—স্বাধীন আলাদা ইচ্ছা আছে এর । আমার ভিতর মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আমি তার দাবি না মিটিয়ে পারি না। ফলে মনে হয় অপরাধ করছি, মা-বাবার চোখের দিকে তাকাতে পারি না .... নারী মূর্তি আমাকে হানা দেয়, আমি আড়ষ্ট হয়ে থাকি।"

১২ থেকে ২০ বছর অর্থাৎ শৈশব আর তারুণ্যের মধ্যবর্তী এই যে সময়—এটা একজন মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে ছোট একটা নৌকা যেমন দুলতে থাকে, যে কোনো মুহূর্তে সে নৌকা তরঙ্গাঘাতে ডুবে যেতে পারে, ধ্বংস হয়ে যেতে পারে চিরতরে, ঠিক তেমনি এ বয়ঃসন্ধিকাল একজন কিশোরের জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ছোট নৌকাটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেমন দরকার সুদক্ষ কোনো মাঝির দৃঢ় হাতে নৌকার হাল ধারণ করা, তেমনি একজন কিশোরের এ কালটাকে পার হয়ে আসার জন্য দরকার সংবেদনশীল ও স্নেহশীল একজন কাণ্ডারির সতর্ক সংসর্গ প্রদান। এ কাণ্ডারি হতে পারে প্রধানত মা-বাবা বিশেষ করে মা।

মা-বাবাকে এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এগিয়ে আসতে হবে বন্ধুরূপে, শিক্ষকরূপে। একান্ত দরদের আপনজন হিসেবে হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম ভালবাসা ও আদর নিয়ে তার সন্তানের মাঝে এসে তাকে দাঁড়াতে হবে—পথ নির্দেশ করতে হবে।

এ বয়সের ছেলেরা অনেকটা দুরন্ত হয়ে উঠতে চায়, নিজেকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করতে চায়। অন্যদিকে মেয়েরা রূপ সচেতন হয়ে ওঠে, সাজগোছ করতে উৎসাহী হয়। পারস্পরিক একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ Transitional period-এ যতসব বিষয় ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনে ছাপ ফেলতে পারে তার সবগুলোর দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সবগুলো দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া দ্রুত এবং অতি সহজে অত্যন্ত প্রভাবিত করে এরূপ

কতগুলো দিকও রয়েছে যেমন টি. ভি, ভিসি. আর, সিনেমা, গান-বাজনা, যাত্রানুষ্ঠান, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, বিদেশী সংস্কৃতিক এবং অপসংস্কৃতিক অনুসরণ, মর্ডান বা আধুনিকতার নামে অনুকরণের প্রবণতা এবং অসৎ সংসর্গ ইত্যাদি।

আজকাল নতুন ফ্যাশন বা স্টাইল দেখা যায়। ঐ বয়সের মেয়েরা শুধুমাত্র জামা পরে রাস্তায় চলাফেরা করে। তাতে শরীরের অবয়ব এমন ভাবে ফুটে বের হয় যে, এ বয়সের ছেলেদের মনে তা দেখে নানারূপ অশুভ চিন্তা নিতে পারে। তাদের অজানা মন নতুন কিছু জানতে চায়। এ ধরনের চাল-চলন নিসন্দেহে তাই অনাসৃষ্টির সহায়ক।

অশ্লীল পত্র-পত্রিকা যারা তৈরি করেন, যারা নাটক, সিনেমা, থিয়েটার করেন এবং লিখেন অথবা যারা এগুলোর ব্যবসা করেন, তারা সকলেই কোনো না কোনো স্তরের বাবা-মা কিংবা ভাই-বোন সর্বোপরি সমাজের একজন ব্যক্তি।

তাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ যত অঙ্গন আছে সকল অঙ্গনে যদি মানুষের সুকুমার বৃত্তির পরিচয় ঘটে তাহলে সামগ্রিকভাবে পরিবেশটা সুন্দর হয়ে ওঠতে পারে।

কিশোর-কিশোরীরা আজ দিশেহারার মত অবস্থায়, কারণ তাদের সামনে কোনো আদর্শ নেই, কোনো লক্ষ্য নেই। তাই দরকার একটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ এবং লক্ষ্যের। সে আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা এগিয়ে যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইসলামই পূর্ণ, সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ সর্বযুগের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ দিয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের জীবনে যত সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তার সমাধান দিয়েছে এবং চলার পথ বলে দিয়েছে। আজ দরকার মুক্তমন নিয়ে সে আদর্শ বুঝবার, উপলব্ধি করার এবং সেই লব্ধজ্ঞান মুতাবেক জীবন পরিচালনা করার।

এ মহান আদর্শের বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে শুধুমাত্র এসবের আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে একটি দিক নিয়ে বলা যায় যে, ইসলাম ১০/১২ বছর বয়স অর্থাৎ কৈশোরের শেষপদ থেকেই ছেলেমেয়েকে আলাদ বিছানায় থাকতে নির্দেশ দিয়েছে, এমন কি বাবা-মার বিছানা থেকেও তাদের আলাদা থাকতে বলা হয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকেই মেয়েদের পর্দা মেনে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ছেলেমেয়ে তথা নারী-পুরুষকে

এমন পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন, যে পোশাক পরলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফুটে বের হয়, অবাধ মেলামেশা নিষেধ করেছে, একা একা নারী-পুরুষ কোনো ঘরে বসে গল্প করতে নিষেধ করেছে, এমনকি বাবা-মা ভাই-বোন, খালা-ফুফু কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া ছেলে বা মেয়েকে অন্য ছেলে বা মেয়ের সামনে যেতে নিষেধ করেছে।

অথচ আজ পার্কের কোনো গাছ তলায় কিংবা লেকের ধারে, পাবলিক লাইব্রেরীর কোনো কর্ণারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সিঁড়িতে বসে কথোপকথন, সিনেমা-থিয়েটারে, কিংবা পাশাপাশি বসে টিভি, ভিসিআরে কোনো অশ্লীল দৃশ্য দর্শন কিসের ইঙ্গিত বহন করে এবং এসব এ বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের কোন্ দিকে নিয়ে যাবে তা বাবা-মাকে বুঝতে হবে।

ঘরের টেলিফোনে বাবা-মার অবর্তমানে কিংবা মর্ডাণ বাবা-মার বর্তমানেই বয় ফ্রেন্ডের সাথে এসব বয়সের ছেলেমেয়েদের যে আলাপ চারিতা চলে এসব কিসের আলামত তা একবার বাবা-মারা চিন্তা করেছেন কি ?

বাবা-মা হিসেবে আজ খুব গভীরভাবে তার ছেলেমেয়ের বয়ঃসন্ধিকাল কিভাবে উতরিয়ে যাচ্ছে তা ভাবতে হবে। কারণ এ বয়সের উপর নানান প্রভাবের কারণে তার ছেলেমেয়ে হাইজ্যাকার, চোর, বদমাশ, খুনী, লুটেরা কিংবা লম্পট, উচ্ছৃংখল হয়ে যেতে পারে।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। যেসব পত্র পত্রিকাকে মানুষ ভাল বলেই জানে সেগুলোতেও প্রায় সবদিন এমন দু একটা বিষয় থাকেই যেগুলোর ভাষা শব্দ এবং ঘটনার বিবরণ এ বয়সী ছেলেমেয়েদের নানা অনভিপ্রেত দিকে সুড়সুড়ি দেয়, বিপথে টানে। বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশন আর উদ্দেশ্যমূলক শব্দচয়ন, বাক্য বিন্যাস এবং সংযোজনা কি ভিন্ন জিনিস নয়।

প্রায় সব ধরনের ম্যাগাজিনের ভেতর যাই থাক না কেন অন্তত কভার পেজে এমন কিছু থাকবেই যা বাণিজ্যিক দিকটাই বড় করে দেখে। এটা কি কেউ বুঝে না ? ভেতরেও এমন কিছু থাকে যা ছেলেমেয়েদের জন্য শুধু নয়, বড়দের জন্যও অনাসৃষ্টি করে।

এসব যারা করেন, লিখেন, সকলেই এক পর্যায়ে গিয়ে বাবা-মা হন, তারাও তখন চান তাদের ছেলেমেয়েরা সুন্দর হোক, ইহজীবন থেকে বিদায় নিয়ে যখন পরজীবনে যায় তখন তাদের ছেলেমেয়েকে সুন্দর দেখে

যেতে চায়, তাই অন্তত আজ ছেলেমেয়ের সেই কল্যাণের দিকটা চিন্তা করে তার লেখা পড়া, চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ কর্মজীবনে যে যাই করুক না কেন তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হোক ভবিষ্যত বংশধরদের সুন্দর ও কল্যাণকর শান্তিময় জীবন—এটাই আজ সকলের কামনা হোক।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন (১-২০ খণ্ড)**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  - আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র)
- **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  - ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- **শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)**
  - ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)**
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **আল কুরআনের শিক্ষা (১-২ খণ্ড)**
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- **সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **আকাশের উপর আকাশ**
  - জাকির আবু জাফর
- **তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে**
  - খলিলুর রহমান মুমিন
- **ইবাদাতের মর্মকথা**
  - শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া
- **মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য**
  - মতিউর রহমান নিজামী
- **মহিলা ফিক্হ (১-২ খণ্ড)**
  - মুহাম্মদ আতাইয়া খামিস
- **আধুনিক রূপকথা**
  - আনোয়ার হোসেন লালন
- **আসমাউল হুসনা**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **জীবন মৃত্যু পরকাল ও আত্মার হালচাল**
  - আবদুল মতীন জালালাবাদী